জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.bjilibrary.com

প্রকাশক

আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম

চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯
ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩৯৩২৭

প্রথম প্রকাশ ঃ

জুন-১৯৯০
জ্যৈষ্ঠ-১৩৯৭
জিলকদ-১৪১০

নবম প্রকাশ

ডিসেম্বর-২০০৯
পৌষ -১৪১৬
মহররম- ১৪৩১

নির্ধারিত মূল্য : ১৬.০০ (ষোল) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে

আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪৫৪১, ৯৩৫৮৩২

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীকে বুঝতে হলে

কোন সংগঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে সংগঠনের দায়িত্বশীলদের দ্বারা প্রকাশিত বক্তব্য থেকেই তা পাওয়া সম্ভব। যারা বিরোধী মহলের অপপ্রচারকে গুরুত্ব দেন তারা অবশ্য সঠিক ধারণা পেতে আগ্রহী নন। তারাও না জেনেই বিরোধিতা করার নীতি পালন করেন।

বিশেষ করে রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে অবচেতনভাবেও মানুষ বিরোধী প্রচারে বিভ্রান্ত হতে পারে। কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির আচরণ এমন হতে পারে না।

যে সংগঠনের পরিচিতি, গঠনতন্ত্র, মেনিফেষ্টো, সংগঠন পদ্ধতি, প্রস্তাবাবলী, কার্যবিবরণী ও কর্মনীতি সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় তার সম্পর্কে জানার জন্য অন্য কোন উৎসের উপর নির্ভর করা মোটেই শোভন নয়।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন একটি সংগঠন যার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে এবং ক্রমেই এর সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর ত্রিবার্ষিক সদস্য (রুকন) সম্মেলনে "জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি" শীর্ষক আমার একটি বক্তৃতা এ পর্যায়ে আরও একটি নতুন সংযোজন।

যারা জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেতে চান তাদেরকে নিম্নের পুস্তিকাসমূহ অধ্যয়নের পরামর্শ দিচ্ছি ঃ

১। পরিচিতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
২। গঠনতন্ত্র- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৩। মেনিফেষ্টো- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৪। সংগঠন পদ্ধতি- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫। কার্যবিবরণী- প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড
৬। জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৭। বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৮। বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী
৯। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

গোলাম আযম
মগবাজার

www.bjilibrary.com

১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় সদস্য (রুকন) সম্মেলন প্রদত্ত ভাষণ।

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

- **কর্মনীতি দ্বারা কি বুঝায়?** ৭
- **জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কর্মনীতি সম্পর্কিত ধারা** ৮
  - দাওয়াত ও তাবলীগ ৯
  - দাওয়াতের কর্মনীতি ৯
  - তাবলীগের কর্মনীতি ১১
- **তানযীম ও তারবিয়াত** ১৩
  - সংগঠিত করার কর্মনীতি ১৩
  - তারবিয়াতের কর্মনীতি ১৫
  - উদ্দেশ্য অনুযায়ীই লোক তৈরি করা হয় ১৬
  - জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ১৭
  - জামায়াতের তারবিয়াতের পদ্ধতি ১৮
  - তারবিয়াতের নেতিবাচক কর্মসূচি ২১
  - ব্যক্তি চরিত্র গড়ার কর্মনীতি ২২
- **ইসলাহে মুয়াশারার কর্মনীতি** ২৭
  - সমাজ সেবামূলক কাজ ২৭
  - সমাজ সেবামূলক কাজের আসল লক্ষ্য ২৯
  - সমাজ সংস্কারমূলক কাজ ৩০
  - ইতিবাচক কাজ ৩১
  - নেতিবাচক কাজ ৩২
- **রাজনৈতিক ময়দানে কর্মনীতি** ৩৩
- **ইসলামী বিপ্লবের সফলতা সম্পর্কে কর্মনীতি** ৩৬
- **জামায়াত নির্বাচনকে একটি শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ মনে করে** ৩৮
- **প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার কর্মনীতি** ৩৯
- **ঈমান সম্পর্কে কর্মনীতি** ৪১
- **ইলম সম্পর্কে কর্মনীতি** ৪৪
- **আমল সম্পর্কে কর্মনীতি** ৪৬
- **কর্মনীতি সম্পর্কে শেষ কথা** ৪৭

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

কোন কাজ সফলতার সাথে সম্পাদন করতে হলে সে কাজটি সঠিক পদ্ধতিতে করা প্রয়োজন। শুধু সাফল্যের আশা করলেই সফল হওয়া যায় না। এমনকি ইখলাসের সাথে কাজ করলেও পদ্ধতি ও কর্মনীতি ভুল হলে সত্যিকার সফলতা হাসিল হয় না।

ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েমের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জামায়াতে ইসলামী কাজ করছে। আসলে এ কাজটি এমনই মহান যে, এর জন্যই যুগে যুগে আল্লাহপাক নবী ও রাসূল (সা.) পাঠিয়েছেন। আল্লাহ পাকের নির্দেশ ও সরাসরি পরিচালনায় তাঁরা এ বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন।

নবী ও রাসূলগণ যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছেন, তা আল্লাহতায়ালাই তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই তা যে শুধু নির্ভুল তাই নয়, এ কাজের জন্য তা-ই একমাত্র উপযোগী। যারা ইকামাতে দ্বীনের কাজ করতে চান, তাদেরকে নতুন করে কর্মনীতি রচনা করতে হবে না। নবী ও রাসূলগণের জীবন থেকে বিশেষ করে শেষ নবী (সা.) এর ২৩ বছর দীর্ঘ বিপ্লবী জীবন এবং তাঁরই প্রতিনিধিত্বকারী খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ জীবন থেকে নিষ্ঠার সাথে কর্মনীতি তালাশ করে নেয়াই একমাত্র সঠিক ও নিরাপদ পথ।

www.bjilibrary.com

কর্মনীতি দ্বারা কি বুঝায়?

কর্মনীতি দ্বারা ব্যাপক অর্থই বুঝায়। ইংরেজী 'পলিসি' শব্দটি এর মর্মার্থ অনেকখানি প্রকাশ করে। 'টেকনিক' শব্দও এর মর্মার্থে শামিল বলা যায়। কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি, কর্মকৌশল ও কর্মধারা মিলেই কর্মনীতি রচিত হয়। তাই কর্মনীতি কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। কুরআনী পরিভাষায় 'হিকমাত' শব্দটি কর্মনীতির মধ্যেই গণ্য।

জামায়াতের চার দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই বার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি তৈরী হয়। একটি বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিকেই কাজ করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি কাজের পেছনে নির্দিষ্ট কর্মনীতি থাকা দরকার। কোন কাজ যদি পলিসি মোতাবেক না হয়, তাহলে সে কাজ মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক হতে পারে না। তাই প্রতিটি ব্যাপারে কর্মনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

জামায়াত যে বিরাট উদ্দেশ্যে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে সফলতা অর্জন করতে হলে সচেতনভাবে জামায়াতের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ ঐ উদ্দেশ্যের উপযোগী নির্দিষ্ট কর্মনীতি অনুযায়ী হতে হবে। তাই কর্মনীতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামের নামে ইখলাসের সাথে অনেক সংগঠনই কাজ করে থাকে। প্রধানত কর্মনীতির পার্থক্যের কারণেই তাদের পক্ষে একই সংগঠনের কাজ করা সম্ভবপর হয় না। এমনকি ইসলামের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কর্মপদ্ধতির পার্থক্যের কারণে কর্মসূচিও ভিন্ন হয়ে যায়।

অবশ্য এ সব পার্থক্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও দ্বীনী সংগঠন সমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহাল থাকতে পারে এবং তা থাকাই ইসলামের দাবী। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কর্মনীতি ও কর্মসূচির পার্থক্যের দরুন তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমেই দ্বীনের খেদমত করতে হয়। এ বিভিন্নতাসহ তাদের পক্ষে এক সংগঠনের কাজ করা বাস্তবেই অসম্ভব। অবশ্য ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় এবং ইসলামের 'কমন ইস্যুতে' সব ইসলামী সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা সম্ভব ও প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কর্মনীতি সম্পর্কিত ধারা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে-

"জামায়াতের স্থায়ী কর্মনীতি নিম্নরূপ হইবে ঃ

১। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা কোন কর্মপন্থা গ্রহণের সময় জামায়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ ও বিধানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করিবে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এমন কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করিবে না যাহা সততা ও বিশ্বাস পরায়ণতার পরিপন্থী কিংবা যাহার ফলে দুনিয়ায় ফিতনা ও ফাসাদ (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়।

৩। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী উহার বাঞ্ছিত সংশোধন ও সংস্কার কার্যকর করিবার জন্য নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মানবিক, নৈতিক চরিত্রের সংশোধন এবং বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর অনুকূলে জনমত গঠন করিবে।

এ ধারায় কর্মনীতি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জামায়াতের গোটা কার্যক্রম এ নির্দেশিকা মোতাবেক চলছে কি না তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা জামায়াতের সদস্যগণের (রুকনগণের) কর্তব্য।

মাওলানা মওদূদী (র.) "ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি" নামক পুস্তিকার দ্বিতীয়ার্ধে জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন বলেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

জামায়াতের ৪ দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করেই এখানে প্রতিটি দফায় জামায়াতের কর্মনীতি আলোচনা করা হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

দাওয়াত ও তাবলীগ

জামায়াতের কর্মসূচির পয়লা দফাই দাওয়াত ও তাবলীগ (আহ্বান ও প্রচার)।

দাওয়াতের কর্মনীতি

দাওয়াত মানে আহ্বান বা ডাকা। প্রত্যেক আন্দোলনই মানুষকে নির্দিষ্ট কোন কথার দিকে ডাকে। জামায়াতে ইসলামীর তিন দফা দাওয়াত নবী ও রাসূলগণের শাশ্বত দাওয়াত থেকেই তৈরি করা হয়েছে। সূরা আল-আরাফের অষ্টম রুকু থেকে এবং সূরা হূদের বিচ্ছিন্নভাবে নবীদের নাম উল্লেখ করে দেখান হয়েছে যে, সকল নবী একই দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াতের বক্তব্য সবাই একই ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ

"হে আমার দেশবাসী-একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোন ইলাহ বা মাবুদ (হুকুমকর্তা) নেই।"

এ দাওয়াতের কর্মনীতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ঃ

১। নবীগণ কোন ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর দিকে মানুষকে ডাকেননি। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর দিকেই ডেকেছেন। আল্লাহর দ্বীন কবুল করার দিকেই তাঁরা আহবান জানিয়েছেন।

২। এ দাওয়াত সকল শ্রেণীর মানুষকেই দেয়া হয়েছে। গোটা মানব সমাজকেই আল্লাহর দিকে আহবান জানান হয়েছে। কোন বিশেষ শ্রেণী, সম্প্রদায়, এলাকা, বর্ণ, গোত্র বা ভাষার লোককে নির্দিষ্ট করে দাওয়াত দেয়া হয়নি। মানব জাতির কোন এক অংশকে আর সব মানুষ থেকে আলাদা কোন শ্রেণী হিসাবে তাঁরা দাওয়াত দেননি। নবীগণের দাওয়াত বিশুদ্ধভাবেই সার্বজনীন।

www.bjilibrary.com

৩। কোন ব্যক্তি, দল বা মানব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের উদ্দেশ্যে বা কারো বিরুদ্ধে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়নি। নবীগণ মানুষকে ভ্রান্ত মত, পথ, নীতি ও বিধান থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করারই দাওয়াত দিয়েছেন এবং যারা ভ্রান্ত পথে চলেছে, তাদেরকেও সে পথ ত্যাগ করার আহবান জানিয়েছেন।

৪। দাওয়াত পেশ করার পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। তাই আল্লাহপাক এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হিদায়াত দিয়ে বলেছেন ঃ

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ (النحل-١٢٥)

"হে রাসূল! আপনার রবের পথে আহবান জানান হিকমত ও উত্তম নসীহতের সাথে। আর লোকদের সাথে বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন।"

সূরা আন-নাহল-১২৫

এ আয়াতের মর্ম ব্যাপক। এখানে তিনটি হিদায়াত রয়েছে ঃ

(ক) যে ব্যক্তি, দল বা কাওমকে দাওয়াত দেয়া হবে তার অবস্থা ভালভাবে জেনে দক্ষ চিকিৎসকের মতো তার হিদায়াতের উপযোগী বক্তব্য পেশ করতে হবে।

(খ) বক্তব্য এমন সুন্দর উপদেশপূর্ণ হতে হবে যাতে তা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং এর মধ্যে তাদের কল্যাণ আছে বলে অনুভব করে।

(গ) যদি কারো সাথে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন হয়, তাহলে এমন শালীনভাবে তা করতে হবে যাতে দাওয়াত কবুল না করলেও তার বিবেক জাগ্রত হয়।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামী নবীদের উপরিউক্ত কর্মনীতি অনুযায়ীই দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করছে। জামায়াত কোন নেতার নেতৃত্ব, কোন দলের আনুগত্য, কোন শ্রেণীর প্রাধান্য বা কোন গোষ্ঠীর স্বার্থের পক্ষে মানুষকে ডাক দেয় না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও নবীর আনুগত্য করা এবং আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করার দাওয়াত দেয়।

তাবলীগের কর্মনীতি

তাবলীগ শব্দের অর্থ হলো পৌঁছান। প্রত্যেক আন্দোলনই মানুষের নিকট তাদের মত ও বক্তব্য পৌঁছানোর চেষ্টা করে। জামায়াতে ইসলামীও স্বাভাবিক কারণেই জনগণের নিকট ইসলামের আলো বিতরণ করে। এ বিষয়ে নবীদের কর্মনীতি অনুযায়ীই জামায়াত কাজ করছে ঃ

১। জামায়াতে ইসলামী ইসলামের কোন একদিকের তাবলীগ করে না। জামায়াত পূর্ণ দ্বীন ইসলামের প্রচার করে। ইসলামের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক অর্থাৎ ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবেই জনগণের নিকট পেশ করা হয়।

২। ইসলামের শিক্ষা পরিবেশন করতে গিয়ে গুরুত্বের ক্রম অনুসারেই বিষয় নির্বাচন করা উচিত। ঈমানের শিক্ষা যার নেই তাকে তাকওয়ার তাকীদ দেয়া মোটেই সঠিক নয়। রাসূল (সা.) হযরত মায়ায বিন জাবাল (রা.) কে ইয়ামানে পাঠানোর সময় এ হিদায়াতই দিয়েছিলেন যে, মানুষকে পয়লা কালেমা ও ঈমান কবুল করার দাওয়াত দেবে। ঈমান কবুল করলে নামাযের শিক্ষা দেবে। এ ভাবে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী তাবলীগ করাই সঠিক পদ্ধতি। *

---

* এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে মাওলানা মওদূদী (র.)-এর রচিত "ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি" বইখানি পড়ুন।

www.bjilibrary.com

৩। তাবলীগ করার উদ্দেশ্য সঠিক না হলে কর্মনীতি ও সঠিক থাকে না। টাকা পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে যারা তাবলীগ করে, তারা মানুষকে দ্বীনের আসল শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। তারা শ্রোতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুখরোচক ওয়াযই করেন। এ জাতীয় ওয়াযে মানুষ মজা পায় কিন্তু হিদায়াত ও দ্বীনের আসল শিক্ষা পায় না।

৪। এ কথা খেয়াল রেখেই তাবলীগ করতে হবে যে, হিদায়ত করার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহপাকের হাতে। মানুষ হিদায়াত হচ্ছে না বলে তাবলীগের কর্তব্য পালনে অবহেলা করা চলবে না। হিদায়াত কবুল করার আগ্রহ দেখা না গেলে তাবলীগ করে কী লাভ এমন মনোভাব সঠিক নয়। এ জাতীয় ধারণা তাবলীগের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মানুষ মানতে রাযী থাক বা না থাক তাবলীগের দায়িত্ব পালন করতে থাকতে হবে।

৫। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান দান করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রচেষ্টায় আল্লাহর রহমতে বিপুল সাহিত্য বাংলাভাষায় সৃষ্টি করা হয়েছে। কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের হাকিকত থেকে শুরু করে ইসলামের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের জ্ঞান লাভের উপযোগী সাহিত্য তাবলীগের জন্য সব চাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশেষ করে মাওলানা মওদূদী (র.) "তাফহীমুল কোরআন" নামে যে তাফসীর রচনা করেছেন, তা বাংলাভাষায় পরিবেশন করায় ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের আসল লক্ষ্য হলো মানুষের চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও পুনর্গঠন تطهير أفكار وتعمير أفكار । মানুষের মন-মগজকে সকল প্রকার জাহিলী চিন্তাধারা থেকে পবিত্র করে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত সঠিক চিন্তাধারা দ্বারা তা পুনর্গঠন করা। মানুষ যত ভ্রান্ত মত পোষণ করে এবং যত ভ্রান্ত পথে চলে তা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবেই করে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর ৪ দফা কর্মসূচির পয়লা দফাই হলো মানুষের চিন্তাকে জাহিলিয়াত থেকে পবিত্র করা ও ইসলামী চিন্তা দ্বারা পুনর্গঠন করা।

www.bjilibrary.com

তানযীম ও তারবিয়াত

জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি হলো তানযীম (সংগঠন) ও তারবিয়াত (প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং)। এ বিষয়ে জামায়াতের কর্মনীতি সুস্পষ্ট।

সংগঠিত করার কর্মনীতি

দ্বীনের দাওয়াত যারা কবুল করে, তাদেরকে সংগঠনের শামিল করা দাওয়াতের স্বাভাবিক দাবী। যারা জনগণকে সংগঠিত করার গুরুত্ব বুঝে না, তারা যত যোগ্যতার সাথেই ওয়ায করুন বিনা সংগঠনে দ্বীনকে বিজয়ী করার কল্পনাও করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, যারা সংগঠন করেন না, তারা দ্বীনের যত খেদমতই করুন, তারা দ্বীনকে কায়েমের কোন পরিকল্পনা রাখেন না।

সাধারণত সমাজের প্রভাবশালী লোকদেরকে পদের লোভ দেখিয়ে হলেও সংগঠনভুক্ত করার প্রথা রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে চালু থাকলেও ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে কোন সংগঠন এ প্রথা মেনে নিতে পারে না।

যারা ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে দল গঠন করে তাদের কথা আলাদা। যারা দ্বীন কায়েমের মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সংগঠিত করতে চায়, তারা দ্বীনের ভিত্তিতেই সংগঠনে লোক ভর্তি করে। ডিগ্রী, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদির ভিত্তিতে দ্বীনী সংগঠনে লোক ভর্তি করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এ জাতীয় লোক সংগঠনে ঢুকান হলে দ্বীনের বিজয়ের পথে তারা বাধাই সৃষ্টি করবে।

www.bjilibrary.com

অবশ্য এ মানের লোক যদি দ্বীনের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হন, তাহলে সোনায় সোহাগা। এ কারণে নবীগণ সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিকটই পয়লা দাওয়াত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন নবীর আমলেই এ জাতীয় লোকেরা দ্বীন কবুল করেনি। তারা কায়েমী স্বার্থের ধারক বলেই এ পথে এগিয়ে আসেনি। তবুও তাদের নিকট দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব রয়েছে। তারা দাওয়াত কবুল না করলেও তাদের নিকট দাওয়াত দেয়ার প্রতিক্রিয়ায় তারা যে বিরোধিতা করে এর ফলে দাওয়াত জনগণের নিকট সহজেই পৌঁছে।

সমাজে যারা মৌলিক মানবীয় গুণের অধিকারী এবং যারা সৎ থাকার বা হবার আগ্রহ রাখে, তাদেরকে ইসলামী সংগঠনভুক্ত করা দাওয়াতে দ্বীনের প্রধান লক্ষ্য হওয়াই স্বাভাবিক। এ জাতীয় লোকদের মযবুত সংগঠন ছাড়া দ্বীনকে বিজয়ী করার কোন বিকল্প নেই।

এ কারণেই রাসূল (সা.) দোয়া করেছিলেন যে, উমর বিন খাত্তাব ও উমর বিন হেশাম (আবু জেহেল) এ দু'জনের অন্তত একজন যেন মুসলিম জামায়াতে শামিল হন যাতে ইসলামী সংগঠন শক্তিশালী হয়।

সমাজের নেক লোকদেরকে যোগ্য বানানোর জন্য এবং যোগ্য লোকগুলোকে নেক বানানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে ব্যাপকভাবে সংগঠনভুক্ত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ইসলামী আন্দোলনের একটি বিশেষ কর্মনীতি। তাই জামায়াত গুরুত্ব সহকারে এ কর্মনীতি পালন করে।

তারবিয়াতের কর্মনীতি

تربيت শব্দটি মূল رَبْوٌ শব্দ থেকে গঠিত। رَبْوٌ অর্থ হলো Growth বা বৃদ্ধি। Development বা প্রবৃদ্ধি, গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি।

رَبْوٌ শব্দটির দু'টো শাব্দিক রূপ আছে ঃ

১। رَبَا يَرْبُوْ এর মানে বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে, ক্রমবিকাশ লাভ করেছে ইত্যাদি।

২। رَبِيَ يَرْبِيْ এর অর্থ গড়ে উঠেছে, বেড়েছে ইত্যাদি। তারবিয়াত শব্দ দ্বারা এ দু'রকম অর্থই বুঝায়।

এছাড়া তারবিয়াত শব্দের মধ্যে رَبَّ يَرُبُّ শব্দের কোন কোন অর্থ শামিল আছে। যেমন ঃ লালন-পালন করা, সংশোধন করা। কিন্তু رَبٌّ শব্দটি رَبْوٌ থেকে গঠিত নয়। رَبَّ - يَرُبُّ শব্দের প্রধান অর্থ প্রভুত্ব করেছে, মালিক হয়েছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে, এসব অর্থের সাথে তারবিয়াত শব্দের কোন সম্পর্ক নেই।

যারা ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াত কবুল করে ইসলামী সংগঠনে শামিল হয়, তাদেরকে গড়ে তুলবার কাজটিই হল তারবিয়াত। তাদের ঈমান-আকীদা মযবুত করা, তাদের জন্য দ্বীনের সঠিক ইলম হাসিল করার ব্যবস্থা করা। তাদের আমল-আখলাককে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা, আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করার জন্য তাদের মনে খালেস জযবা পয়দা করা, বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা, জেল

www.bjilibrary.com

ফাঁসি ও মৃত্যুর ভয় তাদের অন্তর থেকে দূর করা। মোটকথা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জন্য জান, মাল, সময়, শ্রম, আরাম, আয়েশ কুরবানী দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পূর্ণরূপে তৈরি করাই এ তারবিয়াতের উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য অনুযায়ীই লোক তৈরি করা হয়

সব কাজের জন্যই যোগ্য লোক তৈরি করার দরকার হয়। কিন্তু সব রকম কাজের জন্য একই ধরনের তারবিয়াত দেয়া হয় না। পুলিশের দায়িত্ব পালনের জন্য এক ধরনের ট্রেনিং দেয়া হয়। শিক্ষকের দায়িত্বের জন্য অন্য রকম ট্রেনিং দিতে হয়। সেনা বাহিনীকে দেশ রক্ষার যোগ্য ট্রেনিংই দেয়া হয়।

যে ধরনের লোক তৈরি করার উদ্দেশ্য, তারই উপযোগী তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান দান করার জন্য মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম তৈরি হচ্ছে না। কারণ সে শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ভিন্ন। আবার দেখা যায় মাদরাসার মতো আলেম পয়দা করা তাবলীগ জামায়াতের উদ্দেশ্য নয়। মানুষকে আখিরাতমুখী করাই তাবলীগ জামায়াতের লক্ষ্য। পীরের খানকার মাধ্যমে মাদারাসার মতো আলেম পয়দা হওয়া সম্ভব নয়। খানকায় যে ধরনের মন-মেজাজ ও অভ্যাস সৃষ্টি হয় তা মাদরাসা দ্বারা হয় না।

এসব উদাহরণ দ্বারা এ কথাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যে রকম লোক তৈরি করতে চায়, সে অনুযায়ীই তারবিয়াতের ব্যবস্থা করে থাকে।

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করাই জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য। এ বিরাট উদ্দেশ্যের জন্য এমন একদল বিপ্লবী মুজাহিদ প্রয়োজন যারা সাহাবায়ে কেরামকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে বাতিল ও তাগুতী শক্তির মোকাবিলায় শহীদ হওয়ার জযবা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এর জন্য যে সব গুণাবলীর সমন্বয় প্রয়োজন, তা শুধু মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রম, তাবলীগের ব্যবস্থা এবং খানকার তারবিয়াত পদ্ধতি দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সম্ভব হতে পারে না।

ইকামাতে দ্বীনের জন্য যে সব গুণ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তার জন্য এর পূর্ণ উপযোগী তারবিয়াতের ব্যবস্থা ছাড়া এ উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া অসম্ভব। অবশ্য মাদরাসা পাস আলেম এবং তাবলীগ ও খানকায় তৈরি দ্বীনদার লোক ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে তারবিয়াত পেলে ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে পারেন।

www.bjilibrary.com

জামায়াতের তারবিয়াত পদ্ধতি

রাসূল (সা.) যে পদ্ধতিতে লোক তৈরি করেছেন জামায়াত হুবহু সে পদ্ধতি অনুযায়ী তারবিয়াতের ব্যবস্থা করেছে। এ পদ্ধতির দু'টো দিক রয়েছে-ইতিবাচক (positive) ও নেতিবাচক (negative)।

রাসূল (সা.) এর ইতিবাচক ৪ দফা তারবিয়াতী কর্মসূচি কুরআন মজীদে চারটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াত চারটির মূল বক্তব্য একই। যদিও ভাষায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে এবং দফা চারটি সব আয়াতে একইভাবে সাজানো নয়।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

(البقرة– ١٢٩)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُوْلاً مِنكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ

(البقرة–١٥١)

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(آل عمران– ١٦٤)

www.bjilibrary.com

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِيْ الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ (الجمعة-٢)

এ চারটি আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে ৪ দফা তারবিয়াতী কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। এ চারটি কাজের মাধ্যমে রাসূল (সা.) লোক তৈরি করেছেন। এটা ইতিবাচক কর্মসূচি ঃ

১। আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত

২। আল-কিতাব শিক্ষা দেয়া

৩। হিকমাত শিক্ষা দেয়া

৪। পবিত্রতা সাধন ও সংশোধন

এ চারটি কাজের সরল অর্থ নিম্নরূপ ঃ

১। জিবরাঈল (আ.) কুরআনের আয়াতসমূহকে যেভাবে তিলাওয়াত করে রাসূল (সা.) এর নিকট পৌঁছাতেন ঠিক সেভাবেই রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে দিতেন এবং মুখস্থ রাখার প্রয়োজনে তিলাওয়াত করার তাগিদ দিতেন।

কুরআন এভাবেই একজন থেকে আর একজনকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে উচ্চারণ করে শিখতে হয়। মুখে মুখে শেখা ছাড়া সঠিক উচ্চারণ করে শেখা অসম্ভব। একজনের মুখ থেকে তিলাওয়াত শুনেই আর একজনের পক্ষে তিলাওয়াত করতে শেখা সম্ভব।

২। তারবিয়াতের দ্বিতীয় দফা হলো কুরআনের অর্থ শিক্ষা দেয়া। কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করা শিক্ষা দেয়াই যথেষ্ট ছিল না। এর অর্থ শিক্ষা দেয়াও রাসূল (সা.)-এর দায়িত্ব ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করার দায়িত্ব রাসূলেরই। তিনিই কুরআনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী

www.bjilibrary.com

ব্যাখ্যাতা। রাসূল (সা.)-এর ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যাকেই কুরআনের ব্যাখ্যা বলে গণ্য করা চলে না।

৩। তারবিয়াতের তৃতীয় দফা হলো হিকমাত শিক্ষা দেয়া। রাসূল (সা.) হিকমত শব্দের অর্থ করেছেন تفقه في الدين অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কে পরিষ্কার বুঝ। রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনের এ পরিমাণ জ্ঞান দান করতেন যার ফলে জীবনে চলার পথে কুরআনের নির্দেশ পালন করা সম্ভব হয়। কুরআনের আলোতে চলার পথ দেখার যোগ্যতাই হিকমত। অর্থাৎ এতটুকু সমঝ-বুঝ হওয়া যাতে হারাম-হালাল বেছে চলার যোগ্যতা হয়।

৪। তারবিয়াতের ৪র্থ দফা হলো তাযকিয়া। এ শব্দটি যাকাতের মূল শব্দ থেকেই গঠিত। যাকাত দ্বারা মালের পবিত্রতা ও উন্নয়ন বুঝায়। তাযকিয়া মানে আল্লাহর অপছন্দনীয় জিনিস থেকে জীবনকে পবিত্র করা এবং তাঁর পছন্দনীয় পথে উন্নতি করা।

রাসূল (সা.) এ কাজটি কিভাবে করতেন? তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। তাঁদের কথা, কাজ ও আচরণের সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করলে তিনি তাদেরকে সংশোধন করতেন। এটা রাসূল (সা.)-এর এক বিরাট দায়িত্ব ছিল। তিনি এ দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেছেন বলেই তাঁর 'তাকরীর'ও হাদীস বলে গণ্য। রাসূলের কথা ও কাজ যেমন হাদীস, তাঁর তাকরীরও হাদীস। তাকরীর মানে যে বিষয়ে রাসূল (সা.) আপত্তি করেন নি।

জামায়াত এ চার দফা তারবিয়াতী প্রোগ্রাম অনুযায়ী সংগঠনভুক্ত লোকদেরকে শুদ্ধ করে কুরআন তিলাওয়াত করার তাকীদ দিয়ে থাকে। প্রত্যেক কর্মী ও সদস্যের (রুকনের) উপরে প্রতিদিন কুরআনের তাফসীর পড়া বাধ্যতামূলক করেছে। প্রতিদিন কমপক্ষে দশ পৃষ্ঠা ইসলামী সাহিত্য

পড়া ও মাসলা-মাসায়েল শিখে হিকমাত শেখার জন্য চাপ দিয়ে থাকে। আর তাযকিয়ার জন্য প্রতিদিন ইহতিসাব বা আত্মসমালোচনা করার ব্যবস্থা দিয়েছে এবং মুহাসাবা বা সমালোচনার মাধ্যমে একে অপরকে সংশোধনের বিধান চালু করেছে।

তারবিয়াতের নেতিবাচক কর্মসূচি

ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই বাতিল ও তাগুতী শক্তির স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই সব নবীর সময়ই যাবতীয় কায়েমী স্বার্থ বিশেষ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি চরমভাবে বিরোধিতা করেছে। শেষ নবীর মাক্কী জীবনের তেরটি বছর বিরোধী শক্তির যুলুম-নির্যাতনে তিনি যে ধৈর্য, সাহস ও মজবুতীর পরিচয় দিয়েছেন তারই ফলে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এসব গুণাবলী পয়দা হয়েছে। তিনি নিজেই যদি ঘাবড়িয়ে যেতেন এবং হিম্মতহারা হয়ে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে ইসলামের বিজয় কখনও আসতো না। এটাই নেতিবাচক ট্রেনিং।

মাদরাসা, তাবলীগ জামায়াত ও খানকার উপর বাতিল ও তাগুত ক্ষিপ্ত হয় না। কারণ তারা এ কথা মনে করে না যে, তাদের ক্ষমতা এ সবের কারণে বিপন্ন হতে পারে বা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে। অথচ বিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে যুলুম-নির্যাতন না হলে আন্দোলনে নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও বিপ্লবী নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে না। যারা যুলুম-নির্যাতনে সবর ও হিকমাতের পরিচয় দিতে পারে, তারাই সকল স্বার্থ কুরবানী দিয়েও সংগ্রামে টিকে থাকে। একমাত্র এ নিয়মেই সাহাবায়ে কেরামের মতো কাফেলা তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছে।

এ জাতীয় ত্যাগী, নিঃস্বার্থ ও মুখলিস লোকদের হাতে ইসলামী হুকুমতের ক্ষমতা না আসলে দ্বীন কায়েম হতে পারে না। তাই মাক্কী যিন্দেগীর তের

www.bjilibrary.com

বছরে অনেক রকম অগ্নিপরীক্ষার পরও হিজরতের চূড়ান্ত পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হলেন, তাঁদের হাতেই ইসলামের বিজয় হয়েছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমন কি ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের পক্ষ থেকে সৃষ্ট হাজারো রকমের বিরোধিতা ইসলামী আন্দোলনে জড়িত সবার জন্য নেতিবাচক ট্রেনিংয়েরই ব্যবস্থা। ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে যাঁরা শহীদ হচ্ছেন, তাঁদের এ শাহাদাত আর সবার জন্য এ পথে চলার হিম্মতই যোগাচ্ছে। এ বিরোধিতার ফলে দুর্বলমনা লোক পিছিয়ে যাচ্ছে এবং শাহাদাতের জযবা নিয়ে সাহসীরা এগিয়ে চলছে।

ব্যক্তি চরিত্র গড়ার কর্মনীতি

রাসূল (সা.) এর লোক তৈরির ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মসূচি অনুসরণ করে জামায়াতে ইসলামী এর সংগঠিত জনশক্তিকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছে। এ কর্মসূচির আওতায় আল্লাহর পথে মানুষকে টেনে আনার জন্য জামায়াত বাস্তবে যা করে থাকে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত।

জামায়াতের সদস্য (রুকন) ও কর্মীগণ প্রত্যেকেই অন্যদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কতক লোককে দাওয়াতী টার্গেটভুক্ত করে। তারা টার্গেটভুক্ত লোকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে এবং তাদেরকে ইসলামী বই পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। কিছুদিন ঘনিষ্ঠ আলোচনা ও মতবিনিময়ের ফলে যখন কেউ দাওয়াত কবুল করে, তখন তাকে সহযোগী সদস্য করে নেওয়া হয়।

এরপর এ সহযোগী সদস্যের পেছনে সময় ও শ্রম ব্যয় করে তাকে কর্মী হওয়ার জন্য রাযী করা হয়। কর্মী হতে হলে সাপ্তাহিক বৈঠকে নিয়মিত হাযির হতে হয় ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য সাধ্যমত মাসিক অর্থ দান

www.bjilibrary.com

করতে হয়। তাছাড়া কর্মী হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে হলে তাকে দু'ধরনের কাজ করতে হয় ঃ

১। নিজকে গড়ে তুলবার জন্য রোজ কুরআনের কিছু অংশের তাফসীর পড়তে হয়। রোজ কমপক্ষে একটি হাদীস শিখতে হয়, রোজ অন্তত দশ পৃষ্ঠা ইসলামী বই পড়তে হয়, মসজিদে জামায়াতে নামায আদায়ের অভ্যাস করতে হয় এবং প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে একবার বিগত দিনের আত্মসমালোচনা করে সংশোধনের প্রতিজ্ঞা নিতে হয়।

২। অন্য লোকদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে তাদেরকে এভাবে কর্মী বানানোর সাধনা করতে হয়।

এ দু'ধরনের কাজ যাতে নিয়মিত চলতে থাকে এর হিসাব রাখার জন্য রিপোর্ট বইতে রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে কাজের অগ্রগতি বুঝা যায়।

এভাবে কাজ করতে থাকলে এক সময় জামায়াতের সদস্য (রুকন) হওয়ার জন্য অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিয়েই সদস্য (রুকন) হতে হয়।

জামায়াতে কর্মরত থাকা অবস্থায় কিভাবে কর্মীকে ধাপে ধাপে জিহাদ চালিয়ে যেতে হয় এবং ক্রমে আল্লাহর পথে অগ্রসর হয় তা থেকে ব্যক্তি গঠনের কর্মনীতি সহজেই বুঝা যায়।

১। প্রথমত ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি কিছুটা ধারণা জন্মিলে এক ব্যক্তি সহযোগী সদস্য হিসাবে কয়েকটি কথা স্বীকার করে নেয়। এ কথাগুলোই সহযোগী সদস্য ফরমে রয়েছে ঃ

আমি বিশ্বাস করি যে,

০ দেশে শান্তি-শৃংখলা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শাসন-ক্ষমতা ধার্মিক, চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থ লোকদের হাতে থাকা প্রয়োজন।

- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে এ ধরনের সৎ ও যোগ্য লোকের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া এই সংগঠনকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন করি।
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আমি জামায়াতে ইসলামীর সহিত সহযোগিতা করিব।
- আমার জীবনকে নৈতিক দিক দিয়া উন্নত করিবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিব।

২। যখন তিনি কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু হয়ে যায়। তাকে আগের অনেক অভ্যাস ইসলামসম্মত নয় বলে ত্যাগ করতে হয়। তার ২৪ ঘণ্টার রুটিন নতুনভাবে তৈরি করতে হয়। জামায়াতে ৫ ওয়াকত নামায পড়ার অভ্যাস তার জীবনে পরিবর্তন আনতে থাকে। ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলও উন্নত হতে থাকে।

তার জীবনের এ বাস্তব পরিবর্তন তার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের মধ্যে কিছুটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাকে আগের মত তাসের আড্ডা ও সিনেমার সাথী হিসাবে না পেয়ে অনেকে ক্ষুব্ধ হয়। পিতা-মাতা, স্ত্রী, ভাই-বোনও চিন্তার ক্ষেত্রে তার সাথী না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী ভাব প্রকাশ করে। এ অবস্থায় তিনি যদি মযবুত হয়ে টিকে থাকতে পারেন, তাহলে এ পথে তার উন্নতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু যদি আপনজনের বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে এ পথে টিকে থাকতে পারবেন না।

ব্যক্তি-চরিত্র গঠনের পথে মানুষের নফস বা দেহের দাবীই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই রূহের শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেহকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাই আল্লাহ দিয়েছেন।

রূহই হলো আসল মানুষ। মানুষের দেহ রূহের বাহন মাত্র। যেমন ঘোড়া হলো মানুষের বাহন। মানুষ লাগাম কষে ঘোড়াকে তার মরযী মতো

www.bjilibrary.com

চালায়। যদি সে লাগাম কষতে না পারে, তাহলে ঘোড়া তাকে কোথাও ফেলে দেবে। ফলে তার গন্তব্যস্থলে সে পৌঁছুতে পারবে না।

আল্লাহ পাক মানুষকে (রূহকে) হুকুম করেছেন যে, সে যেন শরীয়তের লাগাম দিয়ে তার দেহকে কষে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির এটাই উদ্দেশ্য। কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ঐ লাগামই দেহের উপর লাগায়।

দেহ বস্তু দিয়ে তৈরি। সে দুনিয়ার বস্তুগত মজাই শুধু বুঝে। ভাল-মন্দ বুঝার ক্ষমতা তার নেই। সে যোগ্যতা রূহকে দেয়া হয়েছে। তাই নফসের তাকীদে খারাপ কাজ করলেও মানুষের বিবেক (রূহ) আপত্তি জানায়। মানুষের দেহের (বস্তুসত্তার) উপর তার রূহের (নৈতিক সত্তার) প্রাধান্য সৃষ্টিই শরীয়তের উদ্দেশ্য।

আল্লাহর মরযী মত দেহের সব শক্তিকে কাজে লাগানোর নৈতিক ক্ষমতার নামই তাকওয়া। জামায়াতে ইসলামীর ইতিবাচক ও নেতিবাচক তারবিয়াত পদ্ধতি এমন বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম যা মানুষকে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের এত লোক শহীদ হওয়া সত্তেও এ আন্দোলনের কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারেনি। বরং শহীদ হওয়ার জযবা তাদের মধ্যে আরও বেড়েই চলেছে।

৩। জামায়াতে ইসলামী ব্যক্তিচরিত্র গঠনের জন্য কর্মীদের উপর নফল যিকর বা তাসবীহ চাপিয়ে দেয় না। নফল ঐ জিনিসেরই নাম যা ফরমায়েশ দিয়ে করাবার কাজ নয়। ফরযের অভ্যাস হলে ক্রমে ফরযের মজবুতীর প্রয়োজনেই নফলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কর্মীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ঈমান, প্রয়োজনীয় ইলম ও ইলম অনুযায়ী মযবুত আমলের তাকীদ অবশ্যই দেয়া হয়। এরই ফলশ্রুতিতে তাকওয়া ও ইহসানের দিকে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়।

৪। ব্যক্তিচরিত্র বলিষ্ঠ ও উন্নতরূপ লাভ করার জন্য জামায়াতের কর্মনীতিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মীদেরকে দায়ী

www.bjilibrary.com

ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা। অপরকে দ্বীনের দিকে ডাকার দায়িত্ববোধ যার মধ্যে সৃষ্টি হয়, তার জীবন ইসলাম মোতাবেক সংশোধন হওয়া স্বাভাবিক। এ কাজ করতে গেলে তার মধ্যে দ্বীনের দিক দিয়ে যে সব দোষ-ত্রুটি রয়েছে, তা সংশোধন করার সিদ্ধান্তও তাকে নিতে হয়। কারণ মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সবাই তার নিজের চরিত্রে কতটুকু ইসলাম আছে তা অবশ্যই যাচাই করবে। তার সামান্য ত্রুটিকেও বড় করে দেখবে। তাকে হাজারো প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে।

এ অবস্থায় যদি তিনি এ কাজ অব্যাহত রাখতে চান, তাহলে তাকে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে মানুষের নিকট দায়ী ইলাল্লাহ হিসাবে টিকে থাকতে হবে। আর যদি নিজকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাকে এ কাজ ক্ষান্ত করতে বাধ্য হতে হবে।

৫। ইসলামী আন্দোলনের প্রতি পদেই তাকে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। কারণ অনৈসলামী সমাজে তিনি ইসলামকে পূর্ণরূপে মেনে চলতে চান। সুদ ও ঘুষ না খেলেও দিতে বাধ্য হতে হয়। হালাল রুযির উপর কায়েম থাকতে গিয়ে সরল জীবন যাপন করতে হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এমন কি পেশা ও চাকরি পর্যন্ত বিপন্ন হয়। এত বাধা সত্ত্বেও যে এ পথে টিকে থাকে, তার মধ্যে এমন মানবিক গুণাবলী বিকাশ লাভ করে যা অন্য কোন উপায়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (র.)-এর "ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি" পুস্তিকাটি অবশ্যই পাঠ্য।

www.bjilibrary.com

ইসলাহে মুয়াশারার কর্মনীতি

জামায়াতে ইসলামীর তৃতীয় দফা হলো ইসলাহে মুয়াশারা বা সমাজ সংশোধনমূলক কাজ। এ কাজটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বহুমুখী। এ কাজ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, কাজের ময়দান যেন প্রশস্ত হয়েই চলেছে। বুঝবার সুবিধার জন্য ইসলাহে মুয়াশারার কাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার। এ সব কাজ বিভিন্ন পার্শ্ব সংগঠন ও সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে করা হয়।

সমাজ সেবামূলক কাজ

জনগণের সেবা ও কল্যাণমূলক কাজগুলোকে সমাজ সেবার কাজ বলা হয়। যেমন ঃ

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় দুর্গত মানুষের জন্য রিলিফ বা ত্রাণ কার্য।

২। বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে দরিদ্র রোগীদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৩। কর্মক্ষম পুঁজিহীন লোকদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সহায়তা করা।

যেমন ঃ

(ক) রিকশা, সেলাই মেশিন, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী সহজ কিস্তিতে কেনার সুযোগ দান।

(খ) সমবায় পদ্ধতিতে পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে সেচ ব্যবস্থা এবং পাওয়ার টিলারের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা।

www.bjilibrary.com

(গ) বিনা সুদে ক্ষুদ্র কাজের মাধ্যমে রোজগার করার সুযোগ দান।

(ঘ) বিভিন্ন ফসলের চাষের জন্য প্রান্তিক চাষীদেরকে বিনা সুদে ঋণ দান।

৪। পল্লী চিকিৎসার উপযোগী মেডিকেল শিক্ষার ব্যবস্থা করে অল্পশিক্ষিত বেকার যুবকদের উপার্জনের ব্যবস্থা।

৫। বিভিন্ন রকমের বৃত্তিমূলক অর্থকরী শিক্ষার মাধ্যমে বেকার যুবকদেরকে উপার্জনের সুযোগ দান।

৬। এতীম ছেলেমেয়েদের প্রতিপালন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করা।

যেমন ঃ

(ক) রাস্তাঘাট ও পুল মেরামত ও তৈরি করা।

(খ) স্বল্পমূল্যের উন্নত চুল্লি ও সৌর চুল্লির শিক্ষা দান।

(গ) উন্নত কৃষি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা।

(ঘ) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি শিক্ষা দান।

(ঙ) এলাকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করা।

www.bjilibrary.com

সমাজ সেবামূলক কাজের আসল লক্ষ্য

সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ সব কাজ ব্যাপকভাবে করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত জনশক্তিকে এ জাতীয় কাজের মাধ্যমেই বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে, যাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে এলে তারা সেবামূলক কাজে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে সীমিত আকারে কাজ করে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হাসিল হবে, তা ক্ষমতায় গিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কাজে লাগানোর সুযোগ হবে।

কর্মীদেরকে জনগণের নিঃস্বার্থ সেবকরূপে গড়ে তোলাই সমাজ সেবামূলক কাজের আসল লক্ষ্য। আর এ কাজ জনগণের সহযোগিতা নিয়েই করতে হয় বলে জনগণও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা ও প্রেরণা পায়। জনগণ শুধু সরকার নির্ভর হলে কোন সরকারই তাদের অবস্থা উন্নত করতে সক্ষম হবে না।

www.bjilibrary.com

সমাজ সংস্কারমূলক কাজ

যে সব কারণে ইসলামী আন্দোলনে জনগণের এগিয়ে আসার পথে বাধা সৃষ্টি হয়, সে সব কারণ দূর করাই সমাজ সংস্কারমূলক কাজের আসল উদ্দেশ্য। এ জাতীয় বাধা কয়েক রকমের হতে পারে।

যেমন ঃ

১। ধর্মের দোহাই তুলে জনগণকে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা।

২। সংস্কৃতির নামে চরিত্র বিনষ্টকারী কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের পথে আসার অযোগ্য করে তোলা।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কল-কারখানা ও সকল পেশায় নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা।

৪। সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ ইত্যাদিতে লিপ্ত করে মানুষকে ভোগবাদী বানিয়ে নৈতিক বন্ধন মেনে চলতে অক্ষম করে দেয়া।

জনগণকে এ সবের কুফল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা কিছু করা সম্ভব তাই সমাজ সংস্কারমূলক কাজ। এ জাতীয় কাজ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ধরনের হতে পারে।

www.bjilibrary.com

ইতিবাচক কাজ

১। ধর্মীয় মতভেদকে ভিত্তি করে মুসলিম সমাজকে বিভক্ত করে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। তাই ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা থেকে মানুষকে বিরত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা।

২। দ্বীনের বিভিন্ন রকম খেদমতে নিয়োজিত সকলকে পরস্পর শ্রদ্ধাশীল করে তুলবার উদ্দেশ্যে দ্বীনি মহলে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ইসলাম বিরোধীদের মোকাবিলায় ইসলাম পন্থীদের একটা প্লাটফর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করা।

৩। জনগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে যে অজ্ঞতা রয়েছে তা দূর করার উদ্দেশ্যে-

(ক) মসজিদের মুসল্লীদেরকে মসজিদভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে মুবাল্লিগের ভূমিকা পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

(খ) তাফসীর ও ওয়ায মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষাকে সহজবোধ্য ভাষায় পেশ করা।

৪। সকল দ্বীনি মহলকে ইকামাতে দ্বীনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যাতে তারা খেদমতে দ্বীনকেই যথেষ্ট মনে না করেন।

৫। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে নতুনভাবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে গবেষণা করা এবং বাস্তব নমুনা স্বরূপ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা।

www.bjilibrary.com

নেতিবাচক কাজ

১। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শিক ও নৈতিক ব্যর্থতা এবং চরিত্রবান মানুষ তৈরি করায় চরম ব্যর্থতা তুলে ধরে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা।

২। সহ শিক্ষার মারাত্মক কুফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও মেয়েদের জন্য সর্বস্তরে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য আন্দোলন করা।

৩। অশ্লীল সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, নাটক, ভিডিও ইত্যাদির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন সৃষ্টি করা।

৪। সুদ, ঘুষ, জুয়া ও মদের প্রচলন বন্ধ করার জন্য জোর দাবী জানাতে থাকা। *

---

* এ নেতিবাচক কর্মসূচিকে সফল করতে হলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ইসলামী নৈতিকতার সীমা রক্ষা করে গান, নাটক, ভিডিও, সাহিত্য ও পত্র পত্রিকা দ্বারা জনগণের নিকট অপসংস্কৃতির বিকল্প পথও দেখাতে হবে।

www.bjilibrary.com

রাজনৈতিক ময়দানে কর্মনীতি

জামায়াতে ইসলামীর চতুর্থ দফা কর্মসূচি হলো ইসলাহে হুকুমাত বা শাসন সংস্কার। এ দফাটি জামায়াতের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দফা। জামায়াতের চার দফা কর্মসূচির একটি দফাই শুধু সরাসরি রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। সুতরাং জামায়াতে ইসলামী রাজনীতি সর্বস্ব সংগঠন নয়। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করতে হলে রাজনীতি থেকে দূরে থাকাও সম্ভব নয়। আল্লাহর রাসূল (সা.) যে রাজনীতি করেছেন, সে রাজনীতি করা দ্বীনেরই দাবী এবং সবচেয়ে বড় দ্বীনি দায়িত্ব।

জামায়াতে ইসলামী যেহেতু "ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন" কায়েম করতে চায়, সেহেতু রাজনীতির ময়দানে জামায়াতের কর্মনীতি সাধারণ রাজনৈতিক দলের মতো হতে পারে না। রাজনৈতিক অঙ্গনে জামায়াতের কর্মনীতি নিম্নরূপ ঃ

১। জামায়াত ক্ষমতা দখলের সুবিধাবাদী রাজনীতি করে না কোন রকমে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা হাসিল করা জামায়াতের কর্মনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগসাজশ করে ক্ষমতায় অংশীদার হওয়া দ্বারা জামায়াতের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

একটি দল হিসাবে শুধু শাসন ক্ষমতা দখল করাই জামায়াতে ইসলামীর আসল রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়। ইসলামী আদর্শকে শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই জামায়াত কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা অবশ্যই সত্য যে, জামায়াতের ঐ লক্ষ্য হাসিল করতে হলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা জামায়াতের হাতে আসতে হবে। অর্থাৎ ক্ষমতা লাভ করা জামায়াতের লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যম মাত্র। তাই জামায়াত ইসলামী মন, মগজ ও চরিত্র বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী তৈরি হওয়ার পূর্বে ক্ষমতা হাতে নিতে চায় না। জামায়াত এক দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে রাজনৈতিক ময়দানে কাজ করে যাচ্ছে।

২। জামায়াতে ইসলামী এমন এক আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে কাজ করছে যা নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয়। তাই রাজনীতির ময়দানেও জামায়াত নৈতিকতার মান বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেয়। মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, নৈতিকতাবর্জিত চালবাজি করা, রাজনৈতিক অঙ্গনে দূষণীয় মনে করা হয় না। সম্ভবত এ কারণেই ধর্মকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে দূরে রাখা অনেকেই প্রয়োজন মনে করে।

আমাদের দেশে সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, দুর্নীতিবাজ, প্রতারক, এমন কি লম্পট প্রকৃতির লোকও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে। রাজনীতির চরিত্র ও নৈতিকতার গুরুত্ব থাকলে এ অবস্থা কখনও হতে পারতো না।

জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানেও নৈতিকতার প্রাধান্য দেখতে চায়। মানুষ আসলেই নৈতিক জীব। যদি রাজনীতি নৈতিকতাবিরোধী লোকদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ কারণেই জামায়াত সৎলোকের শাসনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। শাসন ক্ষমতা অসৎ লোকের হাতে থাকলে সমাজে সততা কোথাও বহাল থাকতে পারেনা। আজ সমাজে যোগ্য লোকেরা প্রায়ই অসৎ। তাই তারা যোগ্যতার সাথেই অসৎ কাজ চালু করছে। জামায়াত শাসন ক্ষমতা থেকে অসৎ লোকদের উৎখাত করতে চায় এবং সৎলোকের শাসন কায়েমের মাধ্যমেই শুধু তা সম্ভব।

৩। রাজনৈতিক ময়দানে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতালিপ্সু লোকেরা এমনভাবে প্রচারণা চালায় যা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও জনদরদের পরিচয় বহন করে না। এরই নাম রাখা হয়েছে পলিটিকস। তাই বিভ্রান্তিমূলক কথা শুনলেই মন্তব্য করা হয় যে, "আমার সাথে পলিটিকস করবেন না।" পলিটিকস করা যে ধোঁকাবাজি এ কথা যেন সবার নিকট স্বীকৃত। জনমত গঠন

করার জন্য সঠিক তথ্য জনগণের নিকট পৌঁছা দরকার। জামায়াত তাই তথাকথিত পলিটিকস করাকে রাজনৈতিক নীতির বিরোধী মনে করে।

৪। জামায়াতে নীতিভিত্তিক রাজনীতি করে, নেতাভিত্তিক নয়। আদর্শই জামায়াতের রাজনীতির লক্ষ্য। যারা নেতাসর্বস্ব রাজনীতি করে, তাদের নিকট নেতার ভাবমূর্তিই প্রধান মূলধন। এমন কি নেতার মৃত্যুর পরও নেতার ছবিকে নিয়েই তারা রাজনীতি করতে বাধ্য হয়। নির্বাচনেও মৃত নেতার ছবিকে দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারপত্রে বড় করে প্রদর্শন করতে হয়। নীতি ও আদর্শের প্রাধান্য থাকলে মৃত নেতার ছবিকে পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করতে হয় না।

গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে সুখ্যাত কোন দেশেই পরলোকগত নেতার ছবি নিয়ে রাজনীতি করার রেওয়াজ চালু হয়নি। দলীয় রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ এবং দেশ গড়া ও পরিচালনার প্রোগ্রামই সেখানে রাজনীতির ভিত্তি। দলীয় নেতার চেয়ে দলীয় নীতিই সেখানে প্রাধান্য পায়।

জামায়াত দলীয় নেতাকে আদর্শের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করে না। বরং নেতাকে ইসলামী আদর্শের কষ্টিপাথরে বিচার করে সমালোচনা ও সংশোধন করে। জামায়াতের নিকট আদর্শ নেতা একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)। ঐ মহান নেতার আনুগত্যই জামায়াতের কাম্য। তাই দলীয় নেতাকে ঐ আনুগত্যের মানদণ্ডে বিচার করেই প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হয়। দলীয় নেতা নিরঙ্কুশ আনুগত্যের অধিকারী নয়।

৫। শক্তির বদলে যুক্তিই জামায়াতের নিকট রাজনৈতিক হাতিয়ার। তাই শক্তি প্রয়োগ ও সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়া জামায়াতের কর্মনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। জামায়াতে ইসলামী কুরআন ভিত্তিক রাজনীতি করে। তাই কুরআনী যুক্তির মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েই এক শ্রেণীর লোক শক্তি প্রয়োগ করে জামায়াতকে প্রতিহত করা প্রয়োজন মনে করছে। কিন্তু যুক্তির বলিষ্ঠ অস্ত্রের সাথে শক্তির ভোঁতা অস্ত্র স্থায়ীভাবে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয় না।

www.bjilibrary.com

ইসলামী বিপ্লবের সফলতা সম্পর্কে কর্মনীতি

ইসলামকে বাস্তবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে জামায়াত অবশ্যই শাসন ক্ষমতার গুরুদায়িত্বভার কাঁধে নিতে চায়। কিন্তু এর জন্য কোন চোরাপথের আশ্রয় নেয়া বা অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করা জামায়াতের কর্মনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্লাহ পাক সূরা আন-নূরের ৫৫নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِيْ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের নিকট আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদের হাতে অবশ্য অবশ্যই দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তুলে দেবেন। যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের হাতে দিয়েছিলেন। আর তাদের জন্য তিনি যে দ্বীনকে পছন্দ করেছেন তা তাদের জন্য মযবুত বুনিয়াদের উপর কায়েম করে দেবেন এবং তাদের (বর্তমান) ভীতিজনক অবস্থা পরিবর্তন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

সূরা আন-নূরে আল্লাহপাক যে ওয়াদা করেছেন তাতে বুঝা গেল যে, তিনি নিজেই ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়ার জন্য ব্যস্ত। তিনি শুধু এর শর্ত পূরণের অপেক্ষায় আছেন। তাই জামায়াতে ইসলামী ঐ শর্ত পূরণের চেষ্টায়ই লেগে আছে। ক্ষমতার পাগল হওয়া জামায়াত মোটেই দরকার মনে করেনা। আল্লাহর বিধান মতো দেশকে চালানোর যোগ্য ঈমান ও চরিত্র সৃষ্টি হলেই ক্ষমতা হাতে আসবে-এ কথাই জামায়াত বিশ্বাস করে।

www.bjilibrary.com

এ শর্তটি পূরণ না হওয়ায় নূহ (আ.), হূদ (আ.), সালেহ (আ.) শোয়াইব (আ.) এবং আরও অনেক নবীর সময় ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়নি। এর জন্য নবীগণ দায়ী নন। জনগণের মধ্য থেকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল একদল লোক যোগাড় হয়নি বলেই ইসলাম বিজয়ী হয়নি। আল্লাহপাক ঐ সব কাওমকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

যে সব নবীর সময় ইসলামী হুকুমাত কায়েম হয়েছে তাঁদের সবার ক্ষমতা একই ধরনের পথে আসেনি। আল্লাহ পাক ইউসুফ (আ.) কে একভাবে ক্ষমতা দিয়েছেন। মূসা (আ.) কে অন্যভাবে ক্ষমতাসীন করেছেন। শেষ নবী (সা.) কে হিজরতের পর বিনা যুদ্ধেই ক্ষমতা দেয়া হয়। অবশ্য পরে তাঁকে যুদ্ধ করেই টিকে থাকতে হয়।

জামায়াতে ইসলামী শেষ নবীর শেখান কর্মনীতি অনুযায়ী লোক তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ঐ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য জামায়াত নির্বাচনকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইসলামী বিপ্লবকে সফল করতে হলে একদিকে যেমন নেতৃত্ব দেয়ার লোক যোগাড় হতে হবে, অপরদিকে তেমনি জনগণের মন-মগজও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে এ কাজ সহজভাবে এগুতে পারে। সঠিক নিয়মে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হলে এ উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভব।

www.bjilibrary.com

জামায়াত নির্বাচনকে একটি শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ মনে করে

সাম্প্রতিক ইরানী বিপ্লব ও আফগান জিহাদের উল্লেখ করে কেউ কেউ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয় বলে মনে করেন এবং সে কারণেই তারা নির্বাচনকে ইসলামী বিপ্লবের উপযোগী মনে করেন না। তারা 'গণবিপ্লবের' পক্ষে যুক্তি দিয়ে থাকেন।

সত্যিকার গণতন্ত্র ও গণবিপ্লবে বুনিয়াদী কোন তফাৎ নেই। জনগণ কোন আন্দোলনের পক্ষে সচেতনভাবে সমর্থন জানালে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতা বদল হতে পারে। গণ আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতা বদলের চেষ্টা সফল করতে হলে বিপুল লোকক্ষয় ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়। আর যদি সে চেষ্টা সফল না হয়, তাহলে ক্ষতির শেষ নেই।

ইরান ও আফগানিস্তানের উদাহরণ বাংলাদেশে অবান্তর। ইরানে নির্বাচনের সুযোগই ছিল না। তাই গণ বিপ্লব ছাড়া উপায় ছিল না। আর আফগানিস্তানকে রুশ সেনাবাহিনী দখল করে ফেলায় গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া কোন পথই ছিল না।

বাংলাদেশে ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য নির্বাচনই সব মহলের নিকট স্বীকৃত। এমন কি সামরিক একনায়কও নির্বাচনকে অস্বীকার করার সাহস রাখে না। অবশ্য একথা ঠিক যে, সরকার গণতান্ত্রিকরীতি অনুযায়ী নির্বাচন হতে দিচ্ছে না। এ অবস্থায় নির্বাচনী এলাকায় ও ভোট কেন্দ্রে গণবিপ্লবের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যালট ডাকাতি ঠেকানোর জন্য ভোটারদেরকে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে বাধ্য করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আইন ও নৈতিকতার দাবী সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে হওয়ায় এ পদ্ধতি চালু করা যে কোন ধরনের

গণবিপ্লবের চাইতে সহজ ও শান্তিপূর্ণ। এ কারণেই বাংলাদেশে বদর ও উহুদের যুদ্ধ এখন ভোট কেন্দ্রেই করতে হচ্ছে।

এ যুদ্ধ যদি ইসলামের পক্ষে লড়া হচ্ছে বলে জনগণ বুঝতে পারে, তাহলে নির্বাচনকেই গণবিপ্লবের রূপ দেয়া সম্ভব। জামায়াত সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয় বলে নির্বাচনকেই বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের সহায়ক মনে করে।

কেউ কেউ নির্বাচনকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের অঙ্গ মনে করেন এবং যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে ভুল ধারণা পোষণ করেন। সার্বভৌম ক্ষমতা কার হাতে আছে এ প্রশ্নেই ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মৌলিক তফাৎ রয়েছে। ইসলাম একমাত্র আল্লাহকেই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র জনগণ বা জনগণের নির্বাচিত আইনসভাকে সার্বভৌম মনে করে। আর সরকারী ক্ষমতা যে নির্বাচিত লোকদের হাতেই থাকা উচিত এ বিষয়ে ইসলাম ও গণতন্ত্রে কোন মতবিরোধ নেই। নির্বাচনের বাস্তব রূপ কী হবে, সে সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকতে পারে।

প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করার কর্মনীতি

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে সরকারী ও বেসরকারী রাজনৈতিক শক্তি হাজারো অপপ্রচার চালায় এবং অত্যন্ত অশালীন ভাষায় কঠোর সমালোচনা করে। জামায়াতকে নির্মূল করার জন্য তাদের বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে থাকে। এমন কি কোন কোন মহল বিনা উস্কানিতেই জামায়াত ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা ও কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তাদের এ জাতীয় দুশমনীর জবাবে জামায়াত যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। জামায়াত গালির জওয়াবে যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য পেশ করে। জামায়াত কখনও অশালীন ভাষা কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করে না।

www.bjilibrary.com

২। জামায়াতের মিছিল, সমাবেশ ও অফিসে যারা বর্বরোচিত আক্রমণ চালায়, তাদের মিছিল-মিটিং-অফিসে জামায়াত কখনও পালটা হামলা করে না।

৩। জামায়াত ও শিবিরের উপর অব্যাহত সন্ত্রাস চালানো সত্ত্বেও জামায়াত কখনও পাল্টা সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করে না। জামায়াত তার কর্মীদেরকে সন্ত্রাসী হতে দিতে চায় না বলেই এত সন্ত্রাস বরদাশত করতে বাধ্য হচ্ছে।

৪। জামায়াত নৈতিক দল ও উন্নত চরিত্র দ্বারা বিরোধিতার মোকাবিলা করতে চায়। দেশবাসী দেখতে পাচ্ছে যে, কারা অন্যায় করছে আর কারা ন্যায়ের পথে আছে। ন্যায়ই চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে বলে জামায়াত বিশ্বাস করে।

৫। আত্মরক্ষা বা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে হামলাকারীদেরকে প্রতিহত করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার জামায়াতের অবশ্যই আছে। তবু জামায়াত কোন অবস্থায়ই বেআইনী অস্ত্র ব্যবহার করা সমর্থন করে না। কারণ বেআইনী অস্ত্র নিজস্ব সিদ্ধান্ত মেনে চলে। সে অস্ত্র আইন বা নীতি মানে না। আর জামায়াত নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

প্রতিপক্ষ এটাকে জামায়াতের দুর্বল দিক মনে করে যথেষ্ট সুযোগ নিচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বশীলরাও সশস্ত্র সন্ত্রাসীদেরকেই সমীহ করে। তবুও জামায়াত এ নীতির উপরই অটল রয়েছে।

ঈমান সম্পর্কে কর্মনীতি

আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও আখিরাতকে সাধারণভাবে বিশ্বাস করে নিলেই ঈমান বিশুদ্ধ হয় না। আল্লাহকে যারা বিশ্বাস করে, তারাই তো শিরকে লিপ্ত হয়। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না সে কাফির কিন্তু মুশরিক নয়। আল্লাহকে স্বীকার করেই মুশরিকরা অন্য সত্তাকে আল্লাহর সাথে বিভিন্নভাবে শরীক করে। তেমনি মুহাম্মদ (সা.) কে রাসূল বলে স্বীকার করেও অনেকে রাসূল (সা.) ছাড়া অন্য লোককেও অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করে। পরকালে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও অনেকে শাফায়াতের ভ্রান্ত ধারণায় বেপরোয়া হয়ে আল্লাহর নাফরমানি করে।

জামায়াতে ইসলামী এ কারণেই ঈমানকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী বিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ কর্মনীতি অবলম্বন করে ঃ

১। আল্লাহর প্রতি ঈমানকে খালেস ও মযবুত করতে হলে সচেতনভাবে সকল প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে।

(ক) আল্লাহর যাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), হক (অধিকার) ও ইখতিয়ার (ক্ষমতা) ইত্যাদির দিক দিয়ে কোন সত্তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করা চলবে না। (তাফসীর "তাফহীমুল কুরআনের" সূরা আল-আনয়ামের ১২৮নং টাকায় শিরকের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেখুন)।

(খ) আল্লাহর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমানের পূর্বশর্ত হলো তাগুতকে অস্বীকার করা, (আয়াতুল কুরসীর তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

www.bjilibrary.com

সূরা আল-বাকারার ২৫৬নং আয়াতে রয়েছে ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

"সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে এমন মযবুত রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হবার নয়।"

তাগুতকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত ছাড়া আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী কিছুতেই পূরণ করা সম্ভব নয়। নাফস, শয়তান, অনৈসলামী শাসনশক্তি, বেদ্বীন অর্থশক্তি, অন্ধ অনুসরণের দাবীদার যাবতীয় শক্তি যারা আল্লাহর বিধানের বিরোধী জীবন যাপনের জন্য চাপ দেয় বা উদ্বুদ্ধ করে, তারাই তাগুতী শক্তি। একই সাথে তাগুত ও আল্লাহর আনুগত্য অসম্ভব এবং এটা মুনাফিকী কর্মনীতি।

২। রাসূল (সা.) এর উপর ঈমানের তাৎপর্য সঠিকভাবে না জানলে রাসূলের প্রতি মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না। এর জন্য কর্মনীতি নিম্নরূপ ঃ

(ক) একমাত্র মুহাম্মদ (সা.) কেই "উসওয়াতুন হাসানা" (সুন্দরতম আদর্শ) মেনে নিতে হবে। আর কোন মানুষকে এ মর্যাদার অধিকারী বলে মানা চলবে না। কারণ একমাত্র রাসূলই মাসুম (নিষ্পাপ), নির্ভুল এবং নিরঙ্কুশ আনুগত্যের অধিকারী। তিনিই একমাত্র সত্যের মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ মাপকাঠিতে অবশ্যই উত্তীর্ণ, কিন্তু তাঁরা স্বয়ং মাপকাঠি নন। রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা এক সমান হতে পারে না। রাসূল (সা.) এর আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই উম্মতের শাশ্বত আদর্শ।

(খ) মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বশেষ রাসূল হিসাবে মানতে হবে এবং আল্লাহ্ পাক আর কোন নবী পাঠাবেন না বলে বিশ্বাস করতে হবে।

(গ) রাসূল (সা.) এর পূর্ণ আনুগত্য করার উদ্দেশ্যে দ্বীনের উস্তাদ হিসাবে যাদেরকে মানা প্রয়োজন তাদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা চলবে না। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতেই তাঁদের নির্দেশ পালন করতে হবে। বিনা দলীলে তাঁদের কথা মানা নবীর আনুগত্যের বিরোধী।

৩। আখিরাতের উপর বিশ্বাসকে খালেস করার প্রয়োজনে নিম্ন কর্মনীতি মেনে নিতে হবে ঃ

(ক) আখিরাতে আল্লাহর ক্ষমতাই নিরঙ্কুশ ও চূড়ান্ত। সুপারিশ করে আল্লাহকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চাপ দেয়ার সাধ্য কারো নেই।

(খ) সুপারিশ একমাত্র তাঁরাই করতে পারবেন, যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা অনুমতি দেবেন। আর তাঁরা একমাত্র ঐ সব লোকের পক্ষেই সুপারিশ করতে পারবেন যাদের পক্ষে আল্লাহর অনুমতি থাকবে।

৪। আল্লাহর কুরআনের সবটুকুর উপরই ঈমান আনতে হবে। কুরআনের কোন অংশ মানা ও কোন অংশ অপছন্দ বা অমান্য করা ঈমানের পরিচয় বহন করে না। কুরআনের কোন কথার যুক্তি বুঝে আসুক বা নাই আসুক তা নির্ভুল ও সঠিক বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং তার যুক্তি তালাশ করতে থাকতে হবে। কিন্তু যুক্তি বুঝে না আসলেও আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

ইলম সম্পর্কে কর্মনীতি

জ্ঞানই মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। সকল সৃষ্টির উপর জ্ঞানের কারণেই মানুষের মর্যাদা এত উন্নত। জ্ঞানের সাধনাই মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করে। জ্ঞানই সঠিক পথের সন্ধান দেয়। কিন্তু নির্ভুল জ্ঞানের অভাবেই মানুষ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়। জ্ঞান মাত্রই সঠিক ও নির্ভুল নয়। একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানই কল্যাণকর। আবার সকল অকল্যাণের মূল কারণই ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞান সত্যিকার জ্ঞানই নয়। কুরআনপাক নির্ভুল জ্ঞানকেই ইলম বলেছে। আর যা নির্ভুল নয় তা কুরআনের ভাষায় ধারণা বা কল্পনা মাত্র।

ইসলামের দৃষ্টিতে নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। মানুষের নিকট সঠিক জ্ঞান পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম হলো ওহী। তাই ওহীর কষ্টিপাথরে যাচাই না করে কোন জ্ঞানকেই সঠিক বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা এবং বোধি (ইলহাম) অবশ্যই জ্ঞানের উৎস। কিন্তু ওহীর মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ না হলে এ সব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে নির্ভুল মনে করা মোটেই নিরাপদ নয়। এ যুক্তির ভিত্তিতেই জামায়াতে ইসলামী জ্ঞানচর্চার নিম্নরূপ কর্মনীতি নির্ধারণ করেছে ঃ

১। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক রাসূল (সা.) এর নিকট যে জ্ঞান দান করেছেন একমাত্র তাই নির্ভুল ও সঠিক। কুরআন ও সুন্নাহই ওহীর জ্ঞানের উৎস।

২। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাবতীয় দায়িত্ব পালনের বেলায়ই ওহীর ইলম তালাশ করা ফরয। যে সব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রত্যক্ষ বিধান পাওয়া যায় না সে সব বিষয়ে ওহীর জ্ঞানের আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ওহীর জ্ঞানকে কোন অবস্থাতেই উপেক্ষা করা যাবে না।

www.bjilibrary.com

৩। হালাল রুযী তালাশ করা যেহেতু ফরয, সেহেতু উপার্জনের উদ্দেশ্যে যে পেশা গ্রহণ করা হয়, সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করাও পরোক্ষভাবে ফরয। যে ব্যক্তি চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করল সে যদি যথাসাধ্য যত্নসহকারে চিকিৎসা বিজ্ঞান আয়ত্ত না করে, তাহলে তার রুযী হালাল হতে পারে না। চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন না করে চিকিৎসা পেশা চালিয়ে যাওয়া সুস্পষ্ট প্রতারণা।

৪। বিজ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে বহু সাধনা দ্বারা মানুষ যত জ্ঞান আহরণ করে, তা যেমন যাচাই-বাছাই না করে গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়, তেমনি বিচার-বিবেচনা না করেই বর্জন করাও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। সকল জ্ঞানকেই ওহীর কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হবে।

অমুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের গবেষণালব্ধ জ্ঞানও সঠিক হতে পারে। আবার মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হলেই তার সাধনার ফসল সঠিক হবে মনে করা যুক্তিপূর্ণ নয়। যার মাধ্যমেই জ্ঞান পরিবেশিত হোক তা গ্রহণ ও বর্জনের পূর্বে দেখতে হবে যে, ওহীর সাথে এর কোন বিরোধ আছে কিনা।

৫। বিজ্ঞান চর্চা করা কুরআনেরই দাবী। আল্লাহ পাক গোটা সৃষ্টিজগতই মানুষের প্রয়োজনে পয়দা করেছেন বলে কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চাই সৃষ্টিলোকের প্রতিটি বস্তু ও শক্তির সন্ধান দেয়। মানুষের উপর আল্লাহতায়ালা খিলাফতের যে বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে হলে মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে সকল বস্তু ও শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। পারমাণবিক শক্তিকে মানব কল্যাণের পরিবর্তে যে ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা খিলাফতের দায়িত্বের বিরোধী।

কুরআন মানুষকে সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ রাখার তাকীদ দিয়েছে যাতে মানুষ বিজ্ঞানের ফসলকে আল্লাহর মরযীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে। (সূরা আলে ইমরান-

১৯১ আয়াত) এ আয়াতে যিকর ও ফিকরের সমন্বয় সাধনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলিম শাসনের অবসানের পর বিগত কয়েক শ'বছর থেকে যাঁরা বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা আল্লাহর যিকরের ধার ধারেনি। আর যারা আল্লাহর যিকরে মশগুল, তারা বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন মনে করেননি। বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হলে যিকর ও ফিকরের সমন্বয় অপরিহার্য।

আমল সম্পর্কে কর্মনীতি

আমল মানে কাজ। আল্লাহর আদেশ বাস্তবে পালন করাকেই আমল বলে। আল্লাহ্ যা করতে বলেছেন তা করা এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা না করাই আমল। আল্লাহর মরযীর বিরুদ্ধে কাজ না করা এবং সব কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের (সা.) তরীকা মত করাই আমল। আমলের দাবী হলো আল্লাহর সব আদেশ ও নিষেধ মেনে চলা। সঠিকভাবে আমল করার জন্য নিম্নরূপ কর্মনীতি অপরিহার্য।

১। রাসূল (সা.) এর শেখানো তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করতে হবে। অন্য কোন মানুষ থেকে এমন কোন তরীকা কবুল করা চলবে না, যা রাসূল (সা.) এর তরীকার সাথে মিল খায় না।

২। আমল মানে বাস্তব কাজ। রুযী-রোজগারের আমল হলো হালাল পথে আয়ের চেষ্টা করা। চেষ্টা না করে কোন দোয়া বা ওযীফা করতে থাকা আমল নয়। চেষ্টা করার সাথে সাথে অবশ্যই দোয়া করতে থাকতে হবে। শুধু দোয়া করা রুযীর আমল বলে গণ্য হতে পারে না।

৩। আল্লাহ তায়ালা বৈরাগ্য জীবন মোটেই পছন্দ করেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, "আমার উম্মতের বৈরাগ্য হলো জিহাদ ফী

www.bjilibrary.com

সাবীলিল্লাহ।" ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ব্যক্তিগত নফল ইবাদাত নিয়ে মশগুল থাকাকে ইসলামী দৃষ্টিতে সহীহ আমল বলা চলে না।

৪। আল্লাহর রাসূল (সা.) এর বাস্তব জীবন ও হিদায়াত এ কথাই প্রমাণ করে যে, নফল ইবাদাতের চেয়ে জন কল্যাণমূলক কাজের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বেশী।

৫। যিকর, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত হলো ঐ সব বুনিয়াদী ইবাদত, যা দুনিয়ার সব কাজকে ইবাদতে পরিণত করে। এ সব বুনিয়াদী ইবাদতের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে যারা দুনিয়ার দায়িত্ব পালন করে, তাদের আমল বাহ্যিক দৃষ্টিতে দুনিয়াদারী বলে মনে হলেও এ ধরনের জীবনধারা দ্বীনদারীরই পরিচয় বহন করে। ঐ সব বুনিয়াদী ইবাদতের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য ঐ জাতীয় আমলেরই নফলও আদায় করা কর্তব্য। নফল যিকর, নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ্জ ও নফল দান-সদকা ফরযের উদ্দেশ্যকেই পূরণ করতে সাহায্য করে।

কর্মনীতি সম্পর্কে শেষ কথা

জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর উপসংহারে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলতে চাই যে, বাস্তবে সঠিকভাবে এ কর্মনীতি মেনে চলা সাধনার ব্যাপার। নীতিকথা বলা যত সহজ, করা ততই কঠিন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জামায়াতের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ এ কর্মনীতি বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ যত্ন নিলেই সংগঠনভুক্ত জনশক্তির পক্ষেও এর মর্যাদা উপলব্ধি করা সম্ভব। আর সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত লোকদের মাধ্যমেই সর্বসাধারণ জামায়াতের এ উন্নত কর্মনীতি দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

www.bjilibrary.com

এ কর্মনীতি বাস্তবে পালন করা হলে এ দেশের মুখলিস দ্বীনদারদের পক্ষে ইকামাতে দ্বীনের এ মহান আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই আল্লাহপাক যাদের অন্তরে ঈমানের দৌলত দান করেছেন, তাদেরকে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করার বিরাট দায়িত্ব জামায়াতের সদস্য (রুকন) ও কর্মীদের উপর রয়েছে। আর এ দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করতে হলে জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

আল্লাহ পাক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) শেখান কর্মনীতি অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামীকে পরিচালিত করার জন্য সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

www.bjilibrary.com

জামায়াতে ইসলামীকে জানার জন্য

নিম্নলিখিত বইগুলো পড়ুন

জামায়াতে ইসলামীর পরিচয়

১. পরিচিতি –বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
২. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৩. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৪. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি
৫. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি
৬. মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন

৭. গঠনতন্ত্র–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৮. মেনিফেস্টো–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৯. সংগঠন পদ্ধতি– বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
১০. ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কর্মী ও রুকন)
১১. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
১২. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন

১৩. সত্যের সাক্ষ্য
১৪. ইকামাতে দ্বীন
১৫. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৬. হেদায়াত
১৭. ইসলামী আন্দোলনঃ সাফল্যের শর্তাবলী
১৮. ইসলামী আন্দোলনঃ কর্মীদের সহীহ্ জযবা
১৯. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
২০. ইসলামী বিপ্লবের পথ
২১. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী
২২. গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

২৩. কার্যবিবরণী–বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী (১ম ও ২য় খণ্ড)
২৪. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২৫. জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় ইতিহাস
২৬. মাওলানা মওদূদীর একটি জীবন একটি ইতিহাস

প্রকাশনা বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯